৭। বাজে কথা

'বাজে কথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত বাজে জিনিসের স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিজের একটি অভিনব সাহিত্যভাবাদর্শের কথা বলিয়াছেন'—আলোচনা কর।

নিজের খেয়ালে মানুষ বাজে খরচ করে বলিয়া তাহার দ্বারা দিয়া যেমন মানুষকে যথার্থভাবে চেনা যায়, তেমনি বাজে কথার দ্বারাদেই আসল মানুষটি ধরা দেয়। একটি বাঁধা রাস্তা দিয়া উপদেশের কথা বহুত আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কেজো মানুষের অনবরত পথ চলারদেই পথটি তৃণ-গুল্ম শূন্য হইয়া একেবারে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে কোন বৈচিত্র্যের সন্ধানই পাওয়া যায় না। আর বাজে কথা নিজস্ব একটি ভঙ্গীতে বলিতে হয় বলিয়া তাহার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য দেখা দেয়, তেমনি আসল মানুষটিকেও চেনা যায়।

পণ্ডিত ব্যক্তি উচ্চাঙ্গের কথা বলিয়া নিজস্ব একটি মহিমা প্রকাশ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিপদ আসে তখনই যখন তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিতে চান। যে-লোকটি কেবল বেদবাক্য বলিয়া নিজস্ব একটি মাহাত্ম্য প্রচার করিতে চান, তাঁহার সাহায্য কেহই কোনদিনই কামনা করেন না।

পার্থিব জিনিসের সাধারণত দুইটি দিক আছে। কোনোটি প্রকাশধর্মী কোনোটি বা একান্ত আবশ্যকতার ছাড়পত্র লইয়া নিজস্ব একটি আসন লাভ করিতে চায়। ঠিক এইভাবে কয়লা আবশ্যক, এবং স্ফটিক মূল্যবান। কোন কোন মানুষ কোন উপলক্ষ ছাড়াই নিজেকে স্ফটিকের মতোই প্রকাশ করিয়া দেয়। তাহার এই স্বাভাবিক উজ্জ্বল প্রকাশকে দেখিয়া মানুষ আনন্দ পায়। পেটের অন্ন ফেলিয়াও সে-উজ্জ্বলতার জন্য মানুষ লালায়িত হয়।

Scanned with CamScanner

এইদিক দিয়া মানুষের একটি শখপ্রবৃত্তি আছে। কয়লা প্রয়োজনের বস্তু, কিন্তু স্ফটিক হারের মধ্যে গ্রথিত হইয়া প্রয়োজনাতীতভাবে প্রিয়জনের গলায় পরানো হয়। স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার জন্যই স্ফটিকের এই বিশেষ মূল্য।

কিন্তু মানুষের এই শখপ্রবৃত্তি সকলের নাই; এবং নাই বলিয়াই অনেকেই বুদ্ধিমান এবং বিবেচক। শুধু দেখিয়া তাঁহারা গভীরতার মধ্যে ডুব দিতে চেষ্টা করেন। কাব্যের মধ্যে তাঁহারা তত্ত্ব খুঁজিতে চান। গল্প শুনিয়া যথেষ্ট গবেষণার পর নিজস্ব বুদ্ধি অনুযায়ী নিন্দা প্রশস্তিবাচন উচ্চারণ করেন। যাহা অকারণ কিংবা অনাবশ্যক তাহার প্রতি কোনদিনই তাঁহারা আকর্ষণ অনুভব করেন না।

স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বা আলোকের উপাসকগণ এই সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই। বরঞ্চ ইহাদিগকে একেবারে অরসিক বলিয়া গিয়াছেন। যাহারা সৌন্দর্যের কথা ভুলিয়া কেবল প্রয়োজনের দিক দেখিয়াই জিনিসের মূল্য নিরূপণ করিতে চাহিয়াছে, প্রাচীনেরা তাহাদিগকে ক্লীব রমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। অথচ ইহারাই সাহিত্যের বিচারকর্তা ও ব্যাখ্যাতা; এবং ইহারা নিজদিগকে গুরুমহাশয়ের ভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই ইঁহাদিগকে কোনভাবে বিরক্ত না করাই সঙ্গত।

সাহিত্যের রাজ্যে যেগুলি যথার্থ বাজে রচনা, সেগুলি কোন বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা করিতে পারে না। এই দিক দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার মধ্যে যেমন কোন ধর্ম-কর্মের কথা নাই, তেমনি ইহা কোন পুরাণ-ইতিহাসের অন্তর্গত নয়। যে-পর্যায়ে আসিয়া মানুষের চেতন-অচেতনের বিচারবোধ বিলুপ্ত হয়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ইহাতে কোন প্রয়োজন সাধিত হইবে না; ইহাকে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন বহন করা একটি নিটোল মুক্তার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সেই চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্যের কিছুমাত্র হ্রাস ঘটিবে না।

এই কাব্যখানি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন, এবং এইজন্যই ইহা এমন স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, ইহা তাই মেঘের মতো উদ্দেশ্যহীনতার সজল হাওয়ায় বন্ধনহীন বেগে অপরূপ নিরুদ্দেশের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মেঘদূত তাই সেই বাজে চোখের জলের কাব্য, যে-চোখের জলকে ইংরেজ কবি টেনিসন অকারণ অশ্রুরূপে অভিহিত করিয়াছেন। অনেকেই

হয় তো এই বিষয়ে আপত্তি তুলিয়া বলিবেন যে, নির্বাসিত যক্ষের বিরহ-বেদনার যে অশ্রু, তাহা নিতান্ত অকারণ নয়। কিন্তু যক্ষ-নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার কালিদাসের রচনার উপলক্ষ মাত্র, ইহা তাঁহার কল্পনার বারিসিঞ্চিত নয়। কবি কালিদাসও অকাট্য স্বীকার করিয়াছেন যে, মেঘাবৃত বর্ষার দিনে অকারণ এক বিরহ বেদনায় মানবমন ভাবাতুর হইয়া ওঠে। মেঘদূত সেই দিশেহারা অকারণ বিরহের কাব্য। কারণহীন এক প্রলাপকে উপজীব্য করিয়া লইয়াছে বলিয়াই বিরহী যক্ষ বিদ্যুৎকে দূতরূপে বরণ না করিয়া লইয়া মেঘকে বরণ করিয়া লইয়াছে। আর সেই মেঘ তাহার মন্থর গতির প্রশান্তিতে পৃথীবনকে প্রফুল্ল করিয়া জনপদবধূর ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টির কটাক্ষকে গ্রহণ করিয়া বহু জনপদের উপর দিয়া বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছে।

কাব্য পড়িবার সময়ে কোন কিছু তথ্য লাভের আশা করিয়া যদি পড়িতে হয়, তবে মেঘদূত পাঠান্তে এইটুকুই তথ্যলাভ হইয়াছে বলা যায় যে, কালিদাসের যুগেও মানুষ ছিল, এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিনটি যথানিয়মেই আসিত। কিন্তু বররুচির সেই অশিষ্ট বিশেষণ যাঁহাদের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা শুধু এইটুকু লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন না। ইহাতে না ঘটবে জ্ঞানের বিস্তার, না হইবে দেশের উন্নতি বা চরিত্রের সংশোধন। কাজেই অকারণ যে-আনন্দ, তাহা রসিকদের জন্যই তোলা থাক।

রবীন্দ্র-কল্পনার অপ্রয়োজনের আনন্দই কাব্যের মূল উৎস স্বরূপে নিজেকে চিরদিন প্রকাশ করিয়াছে। সাহিত্য পাঠের আনন্দ কখনো প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত হয় না। অকারণ আনন্দের মধ্যেই তাহার শাশ্বতকালের রসরূপ আত্মপ্রকাশ করে। এই আনন্দ আছে বলিয়াই মানুষের জীবন ও জগতে চিরদিন শিল্পসৃষ্টির রূপ বিকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সেই অপ্রয়োজনের আনন্দই এই 'বাজে কথা' প্রবন্ধটিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।